ড. রুদ্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম

অপধারণার অবসান

"সত্যের জন্য সবকিছুকেই ত্যাগ করা যায়,
কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।"

বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম

রুদ্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক হোসেনুর রহমান একটি প্রবন্ধ তথা পুস্তক রচনা করেছেন। প্রবন্ধটির নাম বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ইসলাম। অধ্যাপক হোসেনুর রহমান দেখিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তর সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য প্রদর্শন করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বেদান্তের কোন বক্তব্যের সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য অনুভব করেছেন বিবেকানন্দ। যতোদূর মনে হয় ঈশোপনিষদের ৬ নং শ্লোকটির কথাই স্মরণ করেছেন বিবেকানন্দ।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে।।

স্বামী গম্ভীরানন্দ এর অর্থ করেছেন, যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন দেখেন, সেই তিনি সেই সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা করে না।

আপনা থেকে পৃথক কোনও বস্তু দর্শন করলে মানুষের ঘৃণা উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু যদি কোনও কিছুই পৃথক না হয় তবে মানুষ কারোকেই ঘৃণা করবে না। মনের মধ্যে অদ্বৈত ভাব এলে মানুষ সবাইকে সমান দেখে। মানুষ সবাইকে সমান দেখলে সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের একদা ধারণা জন্মেছিল ইসলামি সমাজে সাম্য বর্তমান। এই ধারণার উৎস সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিতেই লেখা আছে, "ইসলাম জাত বা বর্ণের পার্থক্য স্বীকার করেনা; কালো বা সাদা, নাগরিক বা সৈনিক, শাসক বা প্রজা, তারা সবাই সমান, শুধু তত্ত্বেই নয়, বাস্তবেও। মাঠে বা বৈঠকখানায়, তাঁবুতে বা প্রাসাদে, মসজিদ বা বাজারে, তারা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, ভক্তিমান মুসলিম এবং একান্ত শিষ্য ছিলেন একজন নিগ্রো ক্রীতদাস... মুহাম্মদের সমগ্র শিক্ষা ইসলামে জাতবিভাগ অসম্ভব করে তুলেছে। এবং ইসলামী আইনে কোনও শব্দকে ক্রীতদাস বলে বর্ণনা করা শব্দের অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয়।"

সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডেনাতে ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে এক ভাষণে বললেন:

"যখনই একজন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ কোনও ধর্ম করেনা। এদেশীয় একজন রেড ইন্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, এবং সে বুদ্ধিমান হইলে যে কোনও উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্যন্ত এমন একটিও গীর্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও নিগ্রো পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই

কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন। ইসলাম ধর্ম তদন্তগত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই ইসলাম ধর্মের নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব।''

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিবেকানন্দ সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু, তুরস্কের সুলতান রেড ইন্ডিয়ান নব্য মুসলমানের সঙ্গে একত্র আহার করবে, এ সংবাদ তিনি কোথায় পেলেন? আর বুদ্ধিমান হলেই সে যে কোনও উচ্চপদ লাভ করবে, এ সংবাদেরই বা উৎস কী? তিনি কি কুতুবুদ্দিন বা ইলতুৎমিশের উদাহরণ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন?

খোলা যাক ইতিহাসের পাতা। জিয়াউদ্দিন বারাণীর 'তারিখ ই ফিরোজ শাহী': ''সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সময় বিশেষ খ্যাতিমান জনৈক রইসের নাম ছিল ফকর বাউনি. সে বাদশাহের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোন সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে সে খেদমতের উপযোগী নানা ধরনের উপঢৌকনসহ সুলতানের বয়স্যদের নিকট হাজির হয়। তাঁহারা এই ব্যক্তির বহুদিনের আশা এবং তাহার নানা প্রকার খেদমতের অজুহাতে তাহাকে বাদশাহের দরবারে হাজির হইবার অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু সুলতান এই আবেদন মঞ্জুর করেন নাই এবং কোনও ক্রমেই এই রইস ব্যক্তিটির সহিত আলাপ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বরং তিনি বলিয়াছিলেন যে বাদশাহীর অর্থ হইতেছে জাঁকজমক, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি। বাদশাহ যদি ইহার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যত্রতত্র গমন করেন এবং যথাযোগ্য মর্য্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবান না হন, তাহা হইলে প্রজা হইতে রাজার পার্থক্য সংরক্ষিত হইবে না। রইস মূলতঃ বাজারী লোকদের সর্দার; বাদশাহ কেমন করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে কিংবা তাহাকে বাদশাহের সম্মুখে জবান খুলিতে আদেশ দিতে পারেন? বাদশাহ যদি নীচমনা, হীনচেতা, রসিক ও বাজে লোকদের সহিত আড্ডা জমান এবং স্বীয় দরবারের প্রয়োজনীয় লোক ব্যতীত বাহিরের লোককে সেখানে স্থান দেন, তাহা হইলে বাদশাহীর গৌরব ও শাসনের ভয়কে নিজের হাতে ধ্বংস করিবেন। ইহাতে প্রজাদের আস্পর্ধা বাড়িয়া যাইবে এবং বাদশাহীর দাপটের কোনও মর্য্যাদা থাকিবে না।''

এখানে স্পষ্ট, অটোম্যান সুলতান কখনও কোনও নব্য মুসলমানের সঙ্গে আহার করতে পারেন না।

আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী র পাতায়: ''সুলতান বলবন সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি আমরোহা অঞ্চলটি আমীর শের জানদারকে অর্পণ করেন। তাঁহার দরবারের কর্মচারীদের নির্দেশ দেন তাহারা যেন সৎ ও সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিকে উক্ত আমরোহা অঞ্চলের মুতসরিফ নিয়োগের জন্য শাহী দরবারে হাজির করে। এই সময় মালীক নিজামুদ্দিন বুঘগালাহ *উকিলে দর* ছিলেন। তাঁহারা কামাল মহিয়ার নামে এক ব্যক্তিকে পছন্দ করিয়া আমরোহা অঞ্চলের খাজা হিসাবে দরবারে উপস্থিত করেন। কামাল মহীয়ার সুলতানের দরবারের ভূমি চুম্বন করিবার সময় সুলতান দরবারের কর্মীদের বলিলেন, 'তোমরা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, মহিয়ার শব্দটি কী এবং ইহার দ্বারা কী বুঝায়?'

সে উত্তরে বলিল, 'মহীয়ার আমার পিতার নাম এবং তিনি হিন্দুর গোলাম ছিলেন।' সুলতান এই কথা শোনা মাত্র দরবার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার খাস দরবার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের হাব ভাব দেখিয়া দরবারীগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন সুলতান ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। ...ঘন্টাখানেক পর আদল শাহ সামসী আজমী, তমর খান,

মালীকুল উমারা, ফকরুদ্দিন কতোয়াল এবং ইমাদুল মূলক রাওতে আরজ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের খাস দরবারে ডাক পড়িল। তাহাদের পর সুলতান মালীক আলাউদ্দিন কশলী খান, মালীক নিজামুদ্দিন বুঘগালাহ্, নায়েব আমীর হাজের, নায়েব উকিলে দর, খান হাজের এবং ইসামী প্রমুখ পাঁচ জনকে দরবারে ডাকিয়া নিলেন এবং বসিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহাদের ও পূর্ববর্তী চারিজনের সম্মুখে বলিলেন, 'আজ আমি আমার এই ভাতিজা হাজেব এবং এই উকিলে দর নিজামুদ্দিন বুঘগালাহের নিকট হইতে এমন এক বিষয় সহ্য করিয়াছি, যাহা আমার পিতার নিকট হইতেও সহ্য করিতাম না। তাহারা এক দাসীপুত্র, যাহার না আছে কোন বংশ গৌরব এবং না আছে কোন গুণ, তাহাকে পছন্দ করিয়া আমার নিকট আনিয়াছে। আমরোহার খাজা পদ তাহাকে দান করুন, সে খুবই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ কর্মী।"

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ইসলাম সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে একেবারে ভ্রান্ত। তিনি সৈয়দ আমীর আলির বক্তব্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেছেন:

"তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যভাবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

"...... মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ।"...

"মহম্মদ নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গ ভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনারী হঠাৎ কোনও গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দেবে। আমাদের এতো উচ্চ দর্শনশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময়, আচরণের সময় আমরা কিরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।"...

"কখনও যদি কোনও ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে।"

নৈনিতালের সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত চিঠি: "ইহাকে আমরা বেদান্ত বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের ও চিন্তার শেষ কথা, কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে, কারণ তাহারা হিব্রু কিংবা আরব—জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্মেপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুদিগের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।

"পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোনও ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া আসিয়া থাকে, তবে ইসলাম ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বর্তমান, সে সম্পর্কে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার, এবং ইসলামপন্থীগণ সে বিষয়ে সাধারণভাবে সচেতন নয়।

"এইজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরুপ সেই একই ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।

"আমাদের নিজেদের মাতৃমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ— একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পুর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ লইয়া মহা গরিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।"

সাম্য বহু প্রকারের হতে পারে—দার্শনিক সাম্য, ধর্মীয় সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য ইত্যাদি। একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিক সাম্যের সঙ্গে সামাজিক সাম্যকে মিশিয়ে ফেলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনা যেহেতু প্রাথমিকভাবে ক্রীতদাসদের নিয়ে, সেহেতু ইসলামি দাসপ্রথা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। ক্রীতদাস-প্রথা মানুষের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। মানুষ যেমন বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়েছিল তেমনই বর্বর শ্রেণীর মানুষকে পোষ মানিয়ে নিজের পরিশ্রমের কাজ তাদের দিয়ে করাতো। সেই মানুষগুলিকে নিজের অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করতো মনিব। প্রয়োজনে তাদের বিক্রী করতো। এইভাবে পৃথিবীতে দাস-প্রথার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকেই মানুষ গরু-ছাগলের মত পণ্য। পরবর্তীকালে যুদ্ধে পরাজিতদের দাসত্বে পর্যবসিত করার প্রথা প্রচলিত হয়। আরও পরে আরম্ভ হয় ঋণগ্রস্তদের ক্রীতদাস করার প্রথা। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া মানুষ নিজেকে বিক্রী করতো। আবার অভাবের তাড়নায় স্ত্রী-পুত্রও বিক্রী করতো মানুষ। ইতিহাসে দেখা যায় ১৮০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চীন দেশের শান রাজবংশে দাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল। এই প্রথা ধারাবাহিকভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল সে দেশে।

ইতিহাসের প্রাতঃকাল থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে ক্রীতদাস-প্রথা বর্তমান ছিল। ১৭৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে হাম্মুরাবির আইনে লিখিত আছে ক্রীতদাস প্রথার কথা। খ্রিষ্টজন্মের অনেক আগে থেকেই মিশর, গ্রীস ও রোমে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল প্রথাটি। মিশরে মনিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রীতদাসকেও মেরে ফেলা হতো, যাতে সে পরলোকে মনিবের সঙ্গী হতে পারে। হিব্রু বাইবেলে প্যালেস্টাইন এবং তার আশপাশের অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার কথা উল্লিখিত আছে।

ক্রীতদাসত্বের আরবী প্রতিশব্দ *উবুদিয়া*, ক্রীতদাসের প্রতিশব্দ *আব্দ* ও *মামলুক*। বাঁদীর প্রতিশব্দ *আমা* কিন্তু কোরানে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর স্থলে '*মা মালাকাত*

আইমানুকুম' বা *'ডান হাতে দখল করা মানুষ'* বলা হয়েছে। কারণ, সাধারণভাবে যুদ্ধে পরাজিত দেশের মানুষরা বিজয়ীদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হয়ে যেত।

মুহাম্মদের পূর্ব থেকেই আরবী প্রতিমাপূজকদের সমাজে ও ইহুদীদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আরব সমাজের অন্য বহু প্রথার মত ইসলাম সেটিকে অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং বৈধ করেছে নানারকম আইন-কানুনের দ্বারা। জেহাদে পরাজিতরা ইসলামী বিধান অনুযায়ী জয়ী মুসলিমদের ক্রীতদাস হয়ে যায়। তখন তাদের বিক্রী করা ও ব্যবহার করার অধিকার জন্মে যায় মুসলিমদের। হজরত মুহাম্মদ নিজেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে মোট উনষাটটি ক্রীতদাসের অধিকারী ছিলেন, আটত্রিশটি ভৃত্য ছাড়াও। মুহাম্মদের এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী জুবেইর মৃত্যুকালে এক হাজার ক্রীতদাসের অধিকারী হয়েছিলেন। এক কথায়, ক্রীতদাসত্ব ইসলামে চিরস্থায়ী ও চিরন্তন প্রথা।

দাসপ্রথা সম্পর্কে কোরানের বক্তব্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

(১) *আরও জেনে রাখো যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুলের, রসুলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য...* (কোরান,৮/৪১)

(২) মুসলিমরা তাদের যে কোনও দাসীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে: *বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবেনা। (কোরান,২৩/১,৫,৬,)*

(৩) *হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন মোহর প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি...* ৩৩/৫০

মুহাম্মদ মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিশকে দূত পাঠিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। উত্তরে মুকাউকিশ দূতের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করে জানিয়েছিলেন, তিনি একটি নূতন পয়গম্বরের আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই পয়গম্বর জন্মাবেন সিরিয়াতে। যাই হোক নবীর দূতের সঙ্গে ভদ্র আচরণই করেছিলেন মুকাউকিশ। তিনি নবীর ব্যবহারের জন্য একটি সাদা খচ্চর, দুই মিশরী ক্রীতদাসী ভগ্নী ও অঙ্গবাস উপহার দিয়েছিলেন। এই দুই মিশরী খ্রীষ্টান ক্রীতদাসী ভগ্নীদের মধ্যে সুন্দরী মেরীকে নিজের জন্য রেখে দিলেন মুহাম্মদ। আর তার ভগ্নী শিরিনকে দিলেন কবি হাসানের ব্যবহারের জন্য।

আবার মদিনার বাজারে সমস্ত কোরাইজা গোষ্ঠির ইহুদী পুরুষদের নিধন করার পরে যে নারী ও শিশু অবশিষ্ট ছিল, তাদের মধ্যে ছিল রেহানা নাম্নী এক সুন্দরী। সেই সুন্দরীকে মুহাম্মদ ধর্মান্তরের পরে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রেহানা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে মুহাম্মদ বাঁদী হিসাবেই গ্রহণ করেন তাঁকে।

(৪) সধবা দাসীদের সঙ্গে সহবাস বৈধ: *নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ৪/২৪*

সমর্থক হাদিশ, *সহী মুসলিম* এর ৩৪৩২ নং : "হজরত আবু সয়ীদ হইতে বর্ণিত আছে: রসলুল্লাহ্ হুনাইন যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে এক সৈন্যদল পাঠাইলেন। তাহারা শত্রুর সম্মুখীন হইল এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল, অবশেষে তাহাদের উপর জয়ী হইল এবং বহু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করিল। অতঃপর নবী করীমের সাহাবীদের মধ্যে কিছু

লোক যেন বন্দিনীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাহাদের সাথে সহবাস করাকে দুষণীয় মনে করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্‌তালা এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করিলেন।"

এখানে সাহাবী হচ্ছে হজরত মুহাম্মদের সহচর; মুশরিক শব্দের অর্থ প্রতিমাপূজক। কোরানের বাক্যকে বলে আয়াত; নাজিল অর্থ উদ্ভব। কোরানের উদ্ভব হওয়া আয়াতটি উপরোক্ত ৪/২৪।

(৫) বাঁদীদের চোখের সামনে মুসলমানদের সম্ভ্রম বজায় রাখার দায়িত্ব নেই: *এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবেনা।* ৭০/২৯-৩০

ইসলামের প্রথম দিকে মক্কায় উদ্ভব হওয়া এইসব কোরান বাক্য নির্দেশ করে যে ইসলাম কিছু ইসলাম-পূর্ব আরবী প্রথা বিনা দ্বিধায় ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা তথা ক্রীতদাসী সঙ্গম অন্যতম।

(৫) মনিবদের কাছে ক্রীতদাসদের অস্তিত্ব তুচ্ছ:

আল্লাহ্‌ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। ১৬/৭১

আল্লাহ্‌ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনও কিছুর উপর শক্তি রাখেনা এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হাতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রচুর ব্যয় করে। ওরা কি একে অপরের সমান? ১৬/৭৫

আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন: তোমাদের আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ কি তাতে অংশীদার? যাতে ওরা তোমাদের সমান হতে পারে এবং তোমরা তোমাদের সমকক্ষদের যেরূপ ভয় করো তোমরা কি ওদের সে রূপ ভয় করো? ৩০/২৮

(৬) মুসলমানরা ক্রীতদাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে।

তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও কোনও কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী, এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। ৪/৩৬

তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। ২৪/৩২

মক্কায় তাঁর শেষ তীর্থযাত্রার সময় মুহাম্মদ অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: "নিজেরা যা খাবে, ক্রীতদাসদেরও তাই খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে ক্রীতদাসদেরও তাই পরাবে। তারা যদি দোষ করে এবং তুমি যদি তাদের ক্ষমা করতে রাজী না থাকো, তবে তাদের বিক্রী করে দেবে।"

(৭) দাসরা মুক্ত হওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করলে দাসদের মুক্তি দিতে হবে: *তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত যুক্তি করতে চাইলে, তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জানো ওদের মুক্তিতে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্‌ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা ওদের দান করবে। তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করোনা; তবে কেউ যদি তাদের বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর*

জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাদেরপ্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৪/৩৩

অর্থাৎ, দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

(৮) দাসমুক্তি পুণ্য কর্ম: *পুণ্য আছে দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে।* ২/১৭৭

কেউ কোনও বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা কর্তব্য। ৪/৯২

তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কী? এ হচ্ছে দাসমুক্তি ৯০/১২-১৩

যারা নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত হতে অস্বীকার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শ্চিত্ত যৌন কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান। ৫৮/৩

মুসলমান দাসমুক্তিকে ইসলামে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ বলেছেন, কেউ যদি মুসলিম দাসকে মুক্ত করেন তবে আল্লাহ্ তার প্রতিটি অঙ্গকে নরকের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। আবু জার প্রশ্ন করেছিলেন, কোন দাসকে মুক্ত করা সব চেয়ে পুণ্যকাজ? নবী উত্তর দিয়েছিলেন, যে দাস মনিবের সবচেয়ে দামী এবং প্রিয়।

এক আরব একদিন নবীকে শুধিয়েছিলেন, কোন কাজ তাঁকে বেহেস্তে নিয়ে যাবে? নবী উত্তর দিয়েছিলেন, একটা দাসকে মুক্ত করলে বা একটা দাসকে মুক্ত হতে সাহায্য করলে।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে; দাসমুক্তি বলতে মুসলিম দাসের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইসলামে অমুসলিম দাসকে মুক্ত করতে নিষেধ। এমনকি মুসলিম দাসদের মুক্তির বিনিময়েও কোনও অমুসলিম দাসকে মুক্ত করা বিধেয় নয়।

কোরানের ও হাদিশের উপরোক্ত বাক্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গৃহীত যাবতীয় স্ত্রী ও পুরুষরা মুসলমানদের ক্রীতদাস-দাসী হয়ে যায়। এবং ক্রীতদাসীদের সঙ্গে মনিবরা খুশীমত সহবাস করতে পারে—তা সে দাসী সধবা হোক বা কুমারী হোক। ইসলামী সমাজে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের অবস্থা মক্কার পাথুরে প্রতিমাগুলির মত—তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার সামর্থ নেই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে কোরানে দাসমুক্তিকে পুণ্য কর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিশ পড়ে জানা যায় মুহাম্মদ যুদ্ধে পরাজিতদের খুশীমত হত্যা করতেন বা ক্রীতদাস করতেন। যদি পরাজিত সৈন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রেই ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হতো। নতুবা বন্দীরা ইসলাম গ্রহণ করার পরেও ক্রীতদাস হয়েই থাকতো।

ইসলামায়িত আরবেরা ক্রীতদাসের মালিকানাকে গর্বের ব্যাপার বলেই বিবেচনা করতো। নবী নিজেই তিনটি সুন্দরী যুদ্ধবন্দিনীকে উপহার দিয়েছিলেন আলি, উসমান ও উমরকে। প্রথম ও দ্বিতীয়জন ছিলেন তাঁর জামাতা, তৃতীয়জন ছিলেন তাঁর অন্যতমা স্ত্রী হাফসার পিতা।

দ্বিতীয় খলিফা উমর ফতোয়া দেন আরব উপদ্বীপের মানুষদের ক্রীতদাস করা যাবেনা। কারণ, তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে দাস সংগ্রহ চলতে থাকে। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ দাস সংগ্রহ করতো।

কিন্তু ক্রুসেডের পরে মুসলমানরা যুদ্ধবন্দী হিসাবে এবং ক্রয় করে শ্বেতাঙ্গ দাসও সংগ্রহ করতে থাকে। দাস ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রোম ও মক্কা। মরোক্কো,

তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি বার্বারী রাষ্ট্রগুলি ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুতা করে শ্বেতাঙ্গ দাস সংগ্রহ করতে থাকে। অ-মুসলিমদের সাধারণভাবে বন্দী করে ক্রীতদাস করার প্রথা বর্তমান থাকার ফলে ইসলামী রাজত্বে দাসব্যবসায় স্ফীতিলাভ করে। মদিনা, দামাস্কাস, কুফা, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, বুখারা, গজনী, দিল্লী প্রভৃতি মুসলিম রাজধানীগুলিতে এবং ভারতের বহু শহরে বৃহদাকারে দাস ব্যবসায় চলতো।

কোরান ও হাদিশের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানরা ক্রীতদাসদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে আমেরিকার ক্রীতদাসদের থেকে ইসলামী সমাজের ক্রীতদাসদের অবস্থা বস্তুগতভাবে পৃথক। শুধু সদাচার নয়, দাসদের জন্য ভাল অন্নবস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে হয় মুসলমানদের। তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানও নিষেধ।

এতৎসত্ত্বেও ইসলামী আইনে দাসদের উপর মনিবের অধিকার ছিল অগাধ। দাসকে হত্যা করলেও ইসলামী আইনে মনিবের কোনও শাস্তি হতোনা মনিবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা দাসদের অধিকারী হয়ে যেত। দাসীরা যদি মনিবের দ্বারা সন্তানের মাতা হতো তবে মনিব ইচ্ছা করলে পিতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতো সেই সন্তানের। সেক্ষেত্রে সেই সন্তান বৈধ সন্তানের মতই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। আবার মনিব কর্তৃক সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যেত ঐ দাসী। নবী স্বয়ং তাঁর মিশরী ক্রীতদাসী মেরীকে মুক্ত করেছিলেন পুত্রবতী হওয়ার পরে। যদিও ঐ পুত্র শৈশবেই মারা যায়। মুক্ত দাস যদি কোনও সম্পত্তি রেখে মারা যেত, এবং তার যদি কোনও উত্তরাধিকারী না থাকতো তবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো পূর্বতন মনিবই।

দাসদের কোনওরকম সামাজিক স্বাধীনতা ছিলনা। মনিবই ছিলেন তার নিয়ন্তা, মনিবের ধর্ম, লিঙ্গ বা বয়স যাই হোক না কেন। মনিবের বিনা অনুমতিতে দাসেরা কোনও সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। মনিবের সদিচ্ছা হলে দাসী-জাত পুত্র বা কন্যার পিতৃত্ব স্বীকার করতো, না করলে সেই সন্তানও ক্রীতদাস রূপেই গণ্য হতো। ইচ্ছামত দাস-দাসীকে বিলিয়ে দিতে বা বিক্রী করতে পারতো মনিব। আবার মনিব ইচ্ছামত দাস-দাসীর বিয়েও দিতে পারতো। তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা মনিবের থাকতো না। দাসদের যেমন কোনও ক্ষমতা থাকতো না তেমনই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তিও হতো অর্ধেক, এবং অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে অর্ধেকেরও কম।

কোনও বাঁদীর মনিব ঐ বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে, কিন্তু তাকে ঐ বাঁদীর সম্পূর্ণ মালিক হতে হবে। আংশিক মালিকানায় সহবাস বৈধ নয়। একজন মুসলমান কতজন ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করবে তার কোনও সীমা নেই। এই ক্রীতদাসীর (অনেক সময় লুট করা) সঙ্গে সহবাসের ধর্মীয় স্বীকৃতির জন্য বর্বর জাতিদের মধ্যে ইসলাম একদা জনপ্রিয় হয়েছিল এবং একই সঙ্গে ইসলাম জনপ্রিয় করেছিল ক্রীতদাস প্রথাকে।

(২)

বর্ণনা করা হলো ইসলামী দাসপ্রথার কথা। কিন্তু দাসপ্রথার বাইরে মুক্ত মানুষদের অবস্থা মোটেই সাম্যের ধারে কাছে নয়। কারণ, সব মানুষ সমান—এই বক্তব্য নিতান্তই আধুনিক। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় রুশো (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778) প্রথমে তাঁর *Du contrat Social* (*The Social Contract*) এ মানুষকে ঈশ্বরের

কবলমুক্ত করে বলেছিলেন 'মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই তাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়েছে।' এ ধারণা সমকালীন ইউরোপের ধর্মীয় চিন্তার পরিপন্থী। কারণ, খ্রিষ্টধর্ম মানুষকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুই শ্রেণীতে স্পষ্ট বিভক্ত করেছে

এ চিন্তা ইসলামেরও পরিপন্থী। কারণ, ইসলামী মতে মানুষ আল্লাহ্‌র দাস। আল্লাহ্‌ মানুষকে সর্বদা নিজের অধীন রাখেন। তিনিই একের থেকে অন্যকে পৃথক করেন। আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসী মানুষদের হত্যা করতে বিধান দেন।

রুশোর পরে এই ধরণের চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে যে জন পদক্ষেপ করলেন তিনি টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson,1773-1826)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট এই চিন্তাবিদ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সূচন রচনা করেছিলেন। সেই সূচন অনুযায়ী ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে বলা হয় সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা হবে।

এর পরের পদক্ষেপ অবশ্যই ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লবকালে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে আগস্ট ঘোষিত হলো, সব মানুষের অধিকার সমান। একজন মানুষকে অন্য মানুষের থেকে পৃথক করা যাবে শুধুমাত্র তার অর্জিত গুণাগুণের ভিত্তিতে।

শুধু রুশো বা জেফারসন নয়, এক শতাব্দীরও বেশী সময় (১৬৪৮-১৭৮৯) জুড়ে ইউরোপে মানুষের চিন্তা-চেতনার এক বিশাল বিবর্তন ঘটে ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়।এই বিবর্তনকে বলা হয় 'ইউরোপীয় আলোকায়ন' (European Enlighten-ment)।

সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর মানুষ কখনও সাম্যের স্বর্গরাজ্যে বাস করতে পারে না। বস্তুতঃ সব মানুষ সমান এটা আল্লাহ্‌র বক্তব্য নয়। তিনিই মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন: *বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্‌! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান করো, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে, দিনকে রাতে পরিণত করো, এবং তুমিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করো (৩/২৬-২৭)।*

আর মানুষকে তিনি এক শ্রেণীভুক্ত করেন নি: *হে মানুষ আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে।* (৪৯/১৩) সুতরাং সব মানুষ সমান, এটা ইসলামের বাক্য নয়। সপ্তম শতাব্দীর পৃথিবীতে সব মানুষ সমান এটা উচ্চারণ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সব মানুষকে সমান করলে, সব মানুষকে ধনী করলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বজায় থাকেনা। কোরানে স্পষ্টই বলা হয়েছে, *আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণই দিয়ে থাকেন। (৪২/২৭)*

ইসলামী ভ্রাতৃসঙ্ঘের কথা

মক্কায় প্রতিমাপূজকদের দ্বারা তাড়িত হয়ে হজরত মুহাম্মদ অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মদিনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মদিনা শুধু মক্কা থেকে দূরবর্তীই নয়, মদিনার জলবায়ু মক্কার থেকে অনেক পৃথক। মক্কার জলবায়ু শুষ্ক ও উত্তপ্ত। পক্ষান্তরে মদিনার জলবায়ু উত্তপ্ত হলেও আর্দ্র। বর্ষার বৃষ্টির পর মরূদ্যানের দক্ষিণ অংশে জল দাঁড়িয়ে যেত। ফলে সেখানে

দেখা দিত নানা রকম জ্বর জারি। সঙ্গে পা ও পেট ফোলা। স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে বিরুদ্ধ পরিবেশে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। মক্কায় ফিরে যাবার কথা ভাবছিল কেউ কেউ।

হজরত মুহাম্মদ মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু মুসলমানদের সঙ্গে মদিনার নাগরিক মুসলমানদের সৌহার্দ্য সৃষ্টি করার জন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি একজন উদ্বাস্তুর সঙ্গে একজন মদিনাবাসী আন্সার বা সাহায্যকারী মুসলমানের সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্য দুজনের মধ্যে সখা পাতালেন বাঙালী মেয়েদের সই পাতানোর মত। চিত্রটা বাস্তব করার জন্য নিজেই জোড় পাতালেন আলির সঙ্গে (মতান্তরে উসমান)। এই বন্ধুত্ব শুধুমাত্র হৃদয়ের নয়, বন্ধুত্বের মধ্যে রইলো বৈষয়িক ব্যাপারও। একজনের মৃত্যুর পর অন্যজন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু মুসলিম এবং বিরোধরত আউস ও খাজরাজ উপজাতির মুসলিমদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে কোরানেও: *এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশিকে শক্ত করে ধরো, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই (ভাই) হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের (নরকের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এরূপ আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।* ৩/১০৩

কিন্তু এই সখা পাতানোর পদ্ধতি অচিরেই আঘাতপ্রাপ্ত হলো উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত বিবাদের জন্য। মুহাম্মদ এই প্রথা বাতিল করে দিলেন বদরের যুদ্ধের পর। সুরা আজহাবে আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন: *আল্লাহ্র বিধানে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের (উদ্বাস্তু) মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর।* (৩৩/৬)

অর্থাৎ, এখন জানা গেল পাতানো ভ্রাতৃত্বের থেকে রক্তের সম্পর্ক নিকটতর। সুতরাং ইসলামী ভ্রাতৃসঙ্ঘের পত্তন করার অর্থ এই নয় যে সব মানুষ সমান। ইসলামী ভ্রাতৃসঙ্ঘের তাৎপর্য রাজনৈতিক। উম্মার সৃষ্টি দ্বারা মুহাম্মদ সমস্ত মুসলিমদের একটি রাজনৈতিক শক্তি তথা জাতির অর্ন্তভুক্ত করে নিলেন। কোরানে আছে উম্মা ও ধর্ম সমার্থক: এই যে তোমাদের উম্মা, এতো এক ধর্মেরই, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা করো। (কোরান, ২১/৯২)

পৌরবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনা অভূতপূর্ব। এই ইসলামী জাতির নাম *মিল্লী* । ইসলামী জাতীয়তাবাদের নাম *মিল্লত* । আরবী মিল্লা শব্দের অর্থ ধর্ম।

কিন্তু আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ জন্মেছেন মক্কার কোরেশ জাতির মধ্যে। কোরানে প্রথম যুগের দুটি সুরাতে কোরেশ জাতির গুণগান করা হয়েছে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহভাজন গোষ্ঠী হিসাবে। সুরা ফিলে বলা হয়েছে: পয়গম্বরের জন্মের বছরে আল্লাহ্ পাখীদের মুখ দিয়ে পাথরকুচি মেরে মেরে খতম করেছেন কোরেশদের হাবসী শত্রুদের এবং অলৌকিকভাবে বজায় রেখেছেন মক্কার স্বাধীনতা। সুরা কোরেশে বলা হয়েছে আল্লাহ্ই কোরেশদের শক্তিমান করেন এবং দিকে দিকে ও শীতে গ্রীষ্মে সার্থবাহ পাঠিয়ে ধনসম্পদ যোগান তাদের।

হাদিশে আছে কোরেশদের সঙ্গে অন্য মুসলমানদের বৈষম্যের কথা। সহী মুসলিমের ৪৪৭৩ নং হাদিশে বলা হয়েছে *সমস্ত মানবজাতিই কোরেশদের তাঁবেদার। যারা মুসলমান*

তারা মুসলমান কোরেশদের তাঁবেদার, যারা কাফের তারা কাফের কোরেশদের তাঁবেদার।

অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে কোরেশরা হচ্ছে বড় ভাই। সেই সঙ্গে যোগ করা যায়, সৈয়দরা হচ্ছে আরও বড় ভাই। কারণ, তাঁরা খোদ পয়গম্বরের বংশজাত কোরেশ। আরবী সৈয়দ কথাটির অর্থ 'প্রভু'।

পয়গম্বর স্পষ্টবাক্যে বিধান দিয়ে গেছেন খলিফার পদ কখনও কোরেশ জাতির বাইরে যাবেনা। যদি দুজন কোরেশও পৃথিবীতে বেঁচে থাকে তবে একজন খলিফা হবে।

ইসলামের চোখে যদি সব মুসলমান সমান হতো তবে এক মদিনীয় মুসলমানই হতেন হজরত মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী। হজরত মুহাম্মদের মৃত্যুর দিন দুপুরে মদিনার এক সভাগৃহে মদিনার আদি অধিবাসীরা একটা সভা করে মদিনাবাসী খাজরাজ জাতির সাদ ইবন ওবাদাকে তাদের নেতা হিসাবে মনোনীত করছিল, যিনি মদিনা বাসীদের পক্ষে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হবেন। এই সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ দুই সহযোগী আবু বকর এবং উমর সেখানে উপস্থিত হলেন। কারণ, একজন মদিনাবাসী আউস বা খাজরাজ উপজাতির লোককে কিছুতেই মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু মদিনাবাসীরা স্বশহরে তাদের এককালীন আশ্রিতদের প্রতাপে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল। তারা আর কোরেশদের আধিপত্য মেনে নিতে চাইছিল না।

আবু বকর সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মদিনাবাসীগণ, তোমরা নিজেদের যে উৎকর্ষের কথা বলছো তা যথার্থ। পৃথিবীর কোনও জাতিরই এতো প্রশংসা প্রাপ্য নয়। কিন্তু আরবরা কোরেশ ছাড়া অন্য কোনও জাতির প্রভুত্ব স্বীকার করেনা। আমরা রাজা, তোমরা আমাদের মন্ত্রী।

—মোটেই নয়! মদিনাবাসীরা চীৎকার করে উঠলো; আমাদের রাজা আমাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে, তোমাদের রাজা তোমাদের মধ্য থেকে।

—তা হতে পারেনা! আবু বকর চীৎকার করে উঠলেন; আমরা রাজা তোমরা আমাদের মন্ত্রী। আমরা জন্মগতভাবে আরবের অভিজাত, শহরের অগ্রগণ্য! এখন তোমরা ঐ দুজনের মধ্য থেকে তোমাদের নেতা পছন্দ করো – ঐ উমর ও আবু ওবেইদার মধ্য থেকে। ওদের প্রতি অনুগত হও।

—হতে পারেনা! উমর চীৎকার করে উঠলেন। পয়গম্বর নিজে কি আদেশ দেন নি– 'ও আবু বকর, তুমি অবশ্যই নমাজ পরিচালনা করবে।' তুমি আমাদের মনিব, তোমার প্রতিই আমাদের আনুগত্য, তুমিই আমাদের মধ্যে সেরা।

এই বলে তিনি আবু বকরের হাত ধরে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ঘটনাটি সবার হৃদয় স্পর্শ করলো। আবু বকরকে সবাই সালাম জানাল পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হিসাবে। আস্তে আস্তে ফাঁকা হয় গেল সভা। সাদ ইবন ওবাদা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দেশত্যাগ করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামের কৈশোরেই এক গোষ্ঠীকে রাজা এক গোষ্ঠীকে উজির বানানো হয়েছে। রাজত্ব করার অধিকার একমাত্র কোরেশ গোষ্ঠীর।

তারপর খলিফাদের আমলে যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে বর্হিজগতে প্রবেশ করলো তখন বর্হিজগতের মুসলমানদের বলা হলো *আজম* বা *মাওয়ালী*। খলিফা উমর আরবী মুসলমান সৈনিকদের আজম নারীদের সঙ্গে সংসর্গ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফিলিপ কে হিট্টি তাঁর 'হিস্ট্রি অফ অ্যারাবস' এ লিখেছেন, "তিনি আরব নন এমন মানুষজনকে সমান অধিকার বা নাগরিকত্ব দিতেও নারাজ হলেন...

এমনকি আরব নন, এমন কেউ ইসলামধর্ম নিলেও তিনি আরবীয় মুসলিমদের সমান অধিকার বা সুযোগ সুবিধা পেতেন না।" আর্বী ও আজমদের মধ্যে আর্বীরাই শ্রেষ্ঠতর বলে ধরে নেওয়া হতো এবং আজও ধরে নেওয়া হয়। ভারতে ইসলাম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নব্য ইসলামায়িত ভারতবাসীর সঙ্গে তুর্কীস্থান থেকে আগত মুসলমানদের ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়। আগেই আমরা দেখেছি, জিয়াউদ্দিন বারানী ভারতজাত মুসলমানদের নীচ বংশজাত বাজারী লোক বলছেন। বিবেকানন্দ ইলতুৎমিশের মত উচ্চ বংশজাত ইলবারী তুর্কী ক্রীতদাসের সঙ্গে কাফ্রী ক্রীতদাসদের গুলিয়ে ফেলেছেন। কারণ, ইসলামী দাসপ্রথা সম্বন্ধে গড় বাঙালীর অজ্ঞতা। বাঙালীর কাছে ক্রীতদাস মানে দাস, মানে ভৃত্য; রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা! যা কিছু হারায় তার জন্য গিন্নি যাকে চোর বলেন অক্লেশে। কিন্তু কি কুতুবুদ্দিন কি ইলতুৎমিশ, কেউই কেষ্টার মত দরিদ্র ও নিম্নবংশজাত ঘরের মানুষ ছিলেন না। এইভাবে মানুষের অবস্থানের পার্থক্য চিরকালই সূচিত হয়ে এসেছে ইসলামী সমাজে। এটা কোনও অবাস্তব ব্যাপার নয়। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সপ্তম শতাব্দীর পৃথিবীতে সবাই সমান এ কথা উচ্চারিত হতে পারেনা। তাও এক ধার্মিক সমাজে!

অপপ্রচারের সূত্র

ইসলামকে শুধু সামাজিক সাম্যের ধর্ম বলা হলো না, সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো জাতিভেদগ্রস্ত ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর ইংলন্ডীয় সাম্রাজ্যবাদী বিদ্বান টমাস কার্লাইল ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে *On Heroes, Hero Worship, and Heroic in History* নামে একটি পুস্তক লেখেন। তার একটি অধ্যায় ছিল *Hero as a Prophet.* তাঁর ঐ প্রবন্ধে সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে ইসলাম সামাজিক সাম্যের ধর্ম। ইসলামকে এই বিদ্বান খ্রিষ্টানীর ভগ্নি বলেই উল্লেখ করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রে ইউরোপীয় আলোকায়নের বিকিরণফল ভারতের উপর বর্ষিত হতে আরম্ভ করে। এই ইউরোপীয় আলোকায়নের প্রথম ভারতীয় ফসল অবশ্যই রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের পর বহু ভারতীয় মনীষার উপর ইউরোপীয় আলোকায়নের বিকিরণফল আপতিত হয়। এদেরই একজন সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৬); ইউরোপীয় চিন্তার আলোকে সৈয়দ আমীর আলি স্বধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হন এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন *The Critical Examination of the Life and Teachings of Mahommed.* এই পুস্তক মুহাম্মদের জীবন ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত। এর পরে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে আমীর আলি লেখেন '*Spirit of Islam*'. এই পুস্তকে যে তিনি ও ইসলামী দাসপ্রথাকে মহান করে তুলবার চেষ্টা করেন তা আগেই বলেছি। সুতরাং সৈয়দ আমীর আলির কলমে যা পড়েছি তা কার্লাইলেরই অনুবর্তন।

ব্যাপারটা শুধু ভারতেই ঘটেনি, অ্যালবার্ট হাউরানী ও বার্নাড লুই লিখেছেন, হাল আমলে আরব ও তুরস্কের শিক্ষিত মানুষরাও প্রচার করতে থাকেন, ইসলাম সামাজিক সাম্যের ধর্ম ।

এর আগে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রথম জনগণনা হয়েছে। সে জনগণনার ফল বিস্ময়কর—বঙ্গদেশের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী, ঢাকা, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে

মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ৪৮ শতাংশই মুসলমান। পূর্ব বাঙলায় মুসলমানদের এই বিস্ময়কর সংখ্যাধিক্য ব্যাখ্যা করার সময় ঐ জন গণনার অধীক্ষ্যক এইচ বেভার্লী তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, "বাংলায় মুসলমানদের আধিক্য দেশে মুঘল রক্ত সঞ্চারের জন্য নয়; কারণ, হিন্দু জাতিভেদ প্রথা এখানকার পূর্বতন অধিবাসীদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল।"

কারণ, বেভার্লী লক্ষ্য করেছিলেন, বাঙলার মুসলমানদের বারো আনাই নিম্নবর্গের।

বেভার্লীর প্রায় সমকালে কিছু কিছু জাতিতত্ত্ববিদও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যেমন, ছোটনাগপুরের কমিশনার এডওয়ার্ড টি ডাল্টন তাঁর 'ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল' পুস্তকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন, "তাঁতীরা তাদের স্বধর্মীদের দ্বারা নীচজাতির বলেই গণ্য হয়। আমার ধারণা সেই কারণে তারা বৃহৎ সংখ্যায় ইসলামায়িত হয় এবং এখন তাদের বলা হয় জোলা।"

বেভার্লী-ডাল্টনের এই উচ্চারণের উপরই পরবর্তীকালের সামাজিক সাম্যের ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারী গেজেটিয়ারে বেভার্লীর মতই নানাভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি সব মানুষ সমান একথা ইসলামে বলা হয়নি। সৈয়দ আমীর আলি ও বেভারলী-ডাল্টনের বক্তব্য সবচেয়ে বেশী দাগ কাটলো এক ইংরেজ চিকিৎসকের। ভদ্রলোকের নাম জেমস ওয়াইজ। ভদ্রলোক সিভিল সার্জন হিসাবে দশ বছর ঢাকায় কর্মরত ছিলেন, খুব নিকট থেকে দেখেছিলেন গ্রামীণ বাঙালী সমাজকে। তিনি গ্রামীণ পরিবেশে এই বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানের সৃষ্টি সম্পর্কে এক তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন। বললেন, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার জন্য স্বধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিম্নবর্গের হিন্দুরা 'সাম্যবাদী' ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে সামাজিক মুক্তির ধর্ম। তিনি এই মর্মে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে একটি কাব্যময় প্রবন্ধ লিখলেন, 'দি মোহমেডান্স অফ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল' নামে। বিখ্যাত মার্কিণ ঐতিহাসিক রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন বেভার্লী-ডালটন-ওয়াইজ উদ্ভাবিত তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'ইসলাম: সামাজিক মুক্তির ধর্ম তত্ত্ব'। ওয়াইজের বর্ণনার মধ্যেই নিহিত এই তত্ত্বের যাবতীয় বক্তব্য। তার মধ্যে আছে পূর্ববঙ্গের সর্প-শ্বাপদ অধ্যুষিত জলাভূমিতে উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত নানা স্তরবিশিষ্ট হিন্দুসমাজ, শোষিত জাতিচ্যুতদের বাস, অত্যাচারী ব্রাহ্মণ সমাজ, ইসলামকে সামাজিক ন্যায়ের ধর্ম হিসাবে বোঝার ক্ষমতাযুক্ত নিম্নবর্গের মানুষ — যারা সেই ইসলামকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

কিন্তু ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের চতুর্থ জনগণনার সূচনে ই. এ. গেইট বললেন, "পূর্ববাঙলার মুসলমানদের সঙ্গে পোদ ও চণ্ডালদের সাদৃশ্য আছে এবং তেমনই সাদৃশ্য আছে উত্তর বাঙলার মুসলমানদের সঙ্গে রাজবংশী ও কোচদের।" গেইট আরও মন্তব্য করলেন, "দেশের এই সমস্ত অংশে অন্য জাতির হিন্দুদের অনুপাত চিরকালই অত্যন্ত কম। উত্তরবঙ্গে মূল জাতি হলো কোচ সমেত রাজবংশী এবং পূর্ববঙ্গে চণ্ডাল ও অন্যান্য অনার্য জাতি।

গেইটের এই বক্তব্য উচ্চবর্ণের অত্যাচারের তত্ত্ব বাতিল করার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, অন্যজাতির অস্তিত্বই ক্ষীণ যেখানে সেখানে অত্যাচার করার জন্য ব্রাহ্মণ কোথায়? কিন্তু গেইট তাঁর এই নিরীক্ষার উপর কোনও তত্ত্ব খাড়া করতে রাজী হলেন না। তিনি শুধু বললেন যে পূর্ববঙ্গের বিশাল সংখ্যক মুসলমানরা স্থানীয় উৎসজাত। কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীর ভারতে ওয়াইজের তত্ত্ব বহুলোকের কাছ অত্যন্ত সঙ্গত মনে হলো। কারণ, সেই জাতিবিভাগ জনিত হীনমন্যতা। হিন্দু সমাজে জাতি বিভাগ আছে, অন্য সমাজে নেই, এমন একটা অপধারণা তখন গভীরভাবে বাসা বেঁধেছে হিন্দু মনে। সেই মানসিকতা আজও পরিত্যাগ করতে পারেনি ভারতীয়রা। বিবেকানন্দের রচনা সেই মানসিকতারই পরিচয়। ইদানীংকালে কিছু গাঁধিবাদী ইসলামকে সামাজিক সাম্যের ধর্ম বলে প্রচার করার চেষ্টা করছেন. ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুনের *দেশ* পত্রিকায় 'ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা চিন্তা' নিবন্ধে অম্লান দত্ত লিখেছেন, "হিন্দু সমাজে অসাম্য যেমন শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করেছে, দৃঢ় আচারের দ্বারা উচ্চনীচ ভেদাভেদ স্বীকৃত হয়েছে, মুসলমান সমাজে তেমন হয়নি।"

আমরা দেখলাম সৈয়দ আমির আলি ইসলামকে সামাজিক সাম্যের ধর্ম বলে প্রচার করার পর বহু বিদ্বৎজনেই সেটি মেনে নিয়েছেন বিনা ইসলাম চর্চায়। অথচ সেই সময় ইসলাম চর্চা করার মত কিছু ভাল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, স্যার উইলিয়াম মিউরের মুহাম্মদ জীবনী, পামার অনুবাদিত কোরান যা ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত *Sacred books of the East* সিরিজের অন্তর্ভুক্ত ও টমাস পাট্রিক হিউয়েজের *Dictionary of Islam.* বিবেকানন্দ এইসব বই পড়েছেন, এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবে তিনি অবশ্যই পড়েছিলেন **Edward Gibbon** এর *The Decline & Fall of The Roman Empire*. কারণ, ঐ পুস্তক বি এ ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। এর ফলে ইসলামের ইতিহাস তাঁর অবশ্যই জানা ছিল; কিন্তু ইসলাম সকপর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাঁর ছিল না। ফলে তিনি সৈয়দ আমীর আলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা কথা লিখেছেন, যা অসত্য। বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে সর্বগ্রাসী পাঠক ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি যদি ইসলামী সাহিত্য ভালোভাবে না পড়ে থাকেন তবে তিনি তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়ার যোগ্য। তবে তাঁর বহু লেখার মধ্যে ইসলামের অসহিষ্ণুতার কথা উল্লিখিত আছে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী' পুস্তিকাতে তিনি ইসলামকে 'বাহ্য ধর্ম' বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামায়িত এবং খ্রিষ্টায়িত ভারতবাসীদের সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য গুরুভ্রাতাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

পিটার হার্ডি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন, "মুসলমানরা আধুনিককালে দাবী করে ভারতে সাম্যতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বের জন্য ইসলাম নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। এই অনুসিদ্ধান্ত প্রত্যয় উৎপাদনক্ষমের চেয়ে আনুমানিকই বেশী। কারণ, শুধু এই নয় যে পুরাতন কালে 'গণতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ব' ও 'সামাজিক সাম্যর' কোনও তাৎপর্য ছিলনা; পরন্তু মুসলিম মৌলভী, শাসক, সুফিদের নিকটবর্তী বহু নিম্নবর্গের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ ছাড়া, মুসলিম ঝাড়ুদারেরা অন্য মুসলমানদের নিকট থেকে একই ধরনের সামাজিক নিপীড়ন ভোগ করে।"

ইসলামকে সামাজিক সাম্যের ধর্ম বলে প্রচার করছেন অনেকে। মার্কিণ ঐতিহাসিক রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন লিখেছেন, "তত্ত্বটি প্রাথমিকভাবে ব্রিটীশ জাতিবিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের দ্বারা সৃষ্ট হলেও বহু পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী এর বিস্তার ঘটিয়েছেন, এবং এই তত্ত্ব সমর্থন করেন বহু সাংবাদিক এবং দক্ষিণ এসিয়ার ইতিহাস চর্চাকারীরা, বিশেষ করে মুসলিমরা। ফলে উপমহাদেশের ইসলামীকরণের তত্ত্ব হিসাবে এই মিথ্যাটি বেশ চলছে। এই তত্ত্ব ধরে নিচ্ছে জাতিভেদের কথা, যা যুগে যুগে অপরিবর্তিত এবং যা নিজ

সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের উপর অত্যাচার করতে নির্দেশ দেয়। এইসব বিদ্বৎদের বক্তব্য, জাতিবিভাগ দ্বারা বহু যুগ ধরে উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্গের মানুষদের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে, এবং যখন সুফি শেখদের দ্বারা বাহিত ইসলাম তার সামাজিক সাম্যের বাণী নিয়ে এলো ভারতে তখন ঐ নিম্নবর্গের মানুষরা সব মানুষ সমান এই সত্য জেনে এবং এতোদিন সামাজিক সাম্য তাদের জন্য অস্বীকার করা হচ্ছিল এই বিবেচনা করে উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলো।"

ইটন যোহানোন ফ্রিডম্যান উল্লেখ করে লিখেছেন, প্রাক আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইসলামকে কখনও হিন্দু সামাজিক অসাম্যের বিপরীতে সামাজিক সাম্যের ধর্ম হিসাবে অভিক্ষেপ করেননি, পরন্তু হিন্দু বহুদেবতাবাদের বিপরীতে ইসলামী একদেবতাবাদের কথাই বলেছেন।"

ইসলামী সর্বসমতাবাদের কথা এখন উচ্চারণ করা হলেও প্রাক-আধুনিক ফার্সী ইতিহাসকাররা কিন্তু কোথাও ইসলামায়নের জন্য হিন্দুদের জাতিবিভাগের কথা উচ্চারণ করেননি। অল বিরুনী, আবুল ফজল, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মুসলিম ইতিহাসকাররা কখনও বলেননি যে ইসলামায়নের জন্য হিন্দুদের জাতিবিভাগ দায়ী। সুফি সাধকদের যে সমস্ত চরিতাবলী পাওয়া যায় সেগুলিতেও কোথাও বলা নেই যে হিন্দুদের জাতিবিভাগের জন্য ইসলামের প্রসার হয়।

তাদের বিশ্লেষণ বলে যে পৃথিবীর অন্যত্র – আরবে, পারস্যে, মধ্য এসিয়া ইত্যাদি স্থানে যে ভাবে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে, ভারতে সেই ভাবেই প্রসারিত হয়েছে ইসলাম। ভারতই একমাত্র দেশ নয় যেখানে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে মধ্যযুগে। ভারতে আসার আগে আফগানিস্থান, পারস্য, মধ্য এসিয়া এবং আফ্রিকাতে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। ঐ সমস্ত স্থানে কোনও জাতিবিভাগ প্রথা ছিলনা। তবুও ঐ সমস্ত স্থানে ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল। বস্তুত, বহুধাবিভক্ত মুসলিম সমাজের পক্ষে অন্য সমাজে জাতিবিভাগ আছে কি না দেখা সমসময়ে একবারেই অচিন্তনীয়।

ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করলে জাতিভেদ দ্বারা গ্রস্ত হতেই হবে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার প্রতিবেদনে মুসলমান ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রদর্শন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতাও আছে।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের ইসলামের মধ্যে বেদান্ত অন্বেষণ একান্তই ভ্রান্ত প্রচেষ্টা।

তথ্যসূত্র:

১. Encyclopedia Britanica, 99 Multmedia Edition, *Slavery*, Historical Survey, Slave-owning societies,

২. T.P.Hughes, *Dictionary of Islam*, Second Rupa impression, 1992.

৩. Margoliouth , *Mohammad and the Rise of Islam*

৪. Ram Swarup, *Understanding Islam through Hadis*

৫. William Muir, *Life of Mahomet,*

৬. H Beverley, *Reports on the Census of Bengal*, (1872)

৭. Edward Tuite Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*,Calcutta, 1872,

৮. E.A. Gait, "Muhammadans", in *Census of India*, 1901

৯. বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়; ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী প্যাসাডেনাস্থিত

ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে প্রদত্ত ভাষণ; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়।

১০. জিয়াউদ্দিন বারানী,*তারিখ ই-ফিরোজ শাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়েশীর বাঙলা অনুবাদ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ পাতা-২৬-২৭

১১. ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারী প্যাসাডেনার সেক্সপীয়ার ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা; *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্য্যালয়

১২. নৈনিতালের মহাম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত চিঠি: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্য্যালয়

১৩. Rafiuddin Ahamd, *Bengal Muslims; A Quest for Identity*, Delhi, (1988),

১৪. Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*, Delhi, (1999)

১৫. জগদীশ নারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), কলকাতা, বাঙলা সন ১৪০০,

১৬. E.A. Gait, "Muhammadans" in *Census of India,*

১৭. Yohanan Friedmann, "Medieval Muslim Views of Religion." Journal of the American Oriental Society, (1975)

quoted in, R.M.Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, Delhi, (1997),

১৯. *কুর'আন শরীফ*, বঙ্গানুবাদ-মাওলানা মোবারক করীম জওহর, হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা-৭ •

২০. SAHI MUSLIM, BY IMAM MUSLIM, Rendered into English by ABDUL HAMID SIDDIQI.Kitab Bhaban, New Delhi-11002

২১. ফিলিপ কে হিট্টি, 'হিস্ট্রি অফ অ্যারাবস' অনুবাদ-জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা

২২. Peter Hardy, Muslims of British India,New Delhi,(1998), p, 10

২৩. R.M.Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, Delhi, (1997)

পি. কে. চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর রোড, কোলকাতা-১২৬ দ্বারা প্রকাশিত ও
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, গঙ্গানগর, কোলকাতা-১৩২ দ্বারা মুদ্রিত।
দাম - দশ টাকা